যুদ্ধাপরাধীর জামিন হয় তবে জামিন হয় না মুক্তিযোদ্ধার

কাইউম পারভেজ, সিডনি থেকে

গত ১৫ জুলাই বাংলার চোখ ডট কম এবং বিডিনিউজ২৪ ডট কমে চোখ পড়তেই চমকে উঠেছি। আমি নিশ্চিত, আমার মতো আরও অনেকেই চমকে উঠেছেন খোলা জীপে ফুলের মালায় আবক্ষ আচ্ছাদিত একাত্তরের ঘাতক মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ছবি দেখে। সত্যি এক বিস্ময়কর ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলেন মওলানা নিজামী। নইলে একটি দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 'জেহাদ'-এ অংশ নিয়ে লাখ লাখ নিরপরাধ নরনারী হত্যা করে আবার সেই দেশেরই মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। সেই দেশের শহীদদের রক্তে রঞ্জিত পতাকা ওড়ে তার গাড়িতে বাড়িতে। সেই দেশের সশস্ত্র বাহিনীসহ পুলিশ বিডিআর তাকে স্যালুট করে। এমন ভাগ্য ক'জনার হয়?

ভাগ্যের বরকতের শেষ নেই। এক-এগারোর পরিবর্তনে যখন দেশের বৃহৎ দু'টি রাজনৈতিক দলের নেত্রীসহ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সারির সবাই মামলায় জড়িয়ে পড়ছেন বা জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে এবং গ্রেফতার করা হচ্ছে তখনো মওলানা নিজামীকে কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। এবং তার দলের মাত্র দু'একজনকে আটক করা হলো। চারদিকে নিন্দা। প্রতিবাদে সোচ্চার। ওরা কেন অধরা? তারপর... তারপর অনেকদিন পর জনগণের জন্য সান্ত্বনা হিসেবে মওলানা নিজামীকে গ্রেফতার করা হলো। সেটাও অনেকটা রাজকীয় আটক। তিনি জেলে গেলেন। দু'একদিনের মধ্যে তিনি তথাকথিত অসুস্থ হলেন। ব্যস চলে গেলেন রাজনীতিবিদদের ট্রানজিট লাউঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিজন সেলে। গ্রেফতারের এক মাস সাতাশ দিনের মাথায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি অমঙ্গলমুক্তি আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করলাম। একমাত্র ভাগ্যবান মওলানা নিজামী বুক চিতিয়ে বেরিয়ে এলেন। গ্যাটকো দুর্নীতি মামলা, যে মামলায় মওলানা সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সে মামলার ২৪ আসামীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ভাগ্যবান যার জামিন হলো তড়িঘড়ি করে। এবং অন্য সব মামলায় জামিনের বিরুদ্ধে আপীল করলেও সরকার মওলানা সাহেবের জামিনের বিরুদ্ধে কোন আপীল করেনি। এমন ভাগ্য ক'জনার হয়? চব্বিশ জন আসামীর অন্যতম আসামী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, তাঁর ভাগ্যও এমন সুপ্রসন্ন হয়নি, যদিও তিনি এই মওলানা সাহেবের ভাগ্যের সকল দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন।

সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাজাকারের নেতৃত্ব দিয়ে মওলানা সাহেব দেশের মন্ত্রী হন। রাজকীয় রাজবন্দী হন এবং রাজকীয় জামিন পান। অথচ দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে জনকণ্ঠের সম্পাদক মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদসহ মুক্তিযোদ্ধারা আজ বন্দী। তাঁদের মুক্তি হয় না। জামিন হয় না। আদালতে জামিন হলেও সঙ্গে সঙ্গে সরকার উচ্চ আদালতে আপীল করে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকারের দরদের নাকি কমতি নেই। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখি না। দেখি তার উল্টোটাই।

গত ১১ জুলাই 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ' আয়োজিত সেমিনারে মুক্তিযোদ্ধা ছদ্মবেশী রাজাকাররা একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে লাঞ্ছিত করেছে। অথচ সরকার এখনও তার বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেয়নি। গ্রেফতার করেনি অপরাধীকে! সরকার এখন বোধহয় ব্যস্ত সদ্য সমাপ্ত 'এসো বাংলাদেশ গড়ি' রোড শোর সফলতা ব্যর্থতার হিসাবনিকাশ নিয়ে। পঞ্চান্ন জেলা ঘুরে সম্প্রতি ঢাকায় এসে শেষ হয়েছে এই রোড শো। লোকে বলাবলি করছে, দেশে নাকি গণতন্ত্র আসছে পাকিস্তান আমলের ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মডেলে।

কোথায় কোন্ মুক্তিযোদ্ধা লাঞ্ছিত হলো তাও আবার জামায়াতীদের হাতে, তাতে সরকারের কী আসে যায়? এ প্রশ্ন আজ জনগণের।

'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ' আয়োজিত সেমিনারে মুক্তিযোদ্ধা ছদ্মবেশী রাজাকারদের হাতে যে বীর মুক্তিযোদ্ধা লাঞ্ছিত হয়েছেন তাঁর প্রতি আমার সহমর্মিতা রইলো এবং আমি এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বিচার চাই। তবে আমার একটি প্রশ্নও আছে তাঁর কাছে। দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠনও তো কম নেই। আপনাকে কেন রাজাকারদের তৈরি তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা

পরিষদে যেতে হবে? রাজাকারদের মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের(?) কাছে আপনাদের কী এমন প্রত্যাশা? আপনারা কেন মেঘলা আকাশের কাছে আলোর আবদার করবেন?

সাঁইত্রিশটা বছর ধরে আমরা কেবল দাবি জানিয়েই গেলাম 'রাজাকার আর স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার কর– করতে হবে'।কিন্তু তাদের বিচার হয় না বরং তারা হয় মন্ত্রী। দুঃখ হয় যারা আমাদের সঙ্গে দাবি করে তারাও কখনও-সখনও নিজের স্বার্থে ওই রাজাকার আর স্বাধীনতাবিরোধীদের তোষণ করে। দলে টানে। দোয়া চায়। বৈঠক করে। কথায় বলে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেও বয়। মওলানা নিজামীদেরও এখন সেই অবস্থা। সাঁইত্রিশ বছর আমরা কেবল দেখতেই থাকলাম এই ভাগ্যবানদের ভাগ্যের খেলা।

আমার সহপাঠী বন্ধু কায়সারুজ্জামান বনির কাছ থেকে শোনা এক গল্পের কথা মনে পড়ল। এ গল্প সবাই শুনেছেন বহুবার। ভানুর ক্যাসেটেও আছে বোধহয়। তবু বলি যদি দুঃখটা হাল্কা হয়। বাড়িতে চোর ঢুকেছে। ভীতু স্বামী টের পেয়েও ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। স্ত্রী টের পেয়ে স্বামীকে বলছে, হ্যাঁগা শুনচো– ঘরে চোর এয়েচে। স্বামী বলছে– আহ্ চুপ মারো। দাঁড়াও দেখি কী করে। চোর আস্তে আস্তে তার ব্যাগে ঘরের গয়নাগাটিসহ মূল্যবান সবকিছু পুরছে। স্ত্রী ফিসফিস করে বলছে– হ্যাঁগা দেখতি পাচ্ছো সব নিয়ে চইলে যাচ্ছে। স্বামী হাল্কা স্বরে খেঁকিয়ে ওঠে– দাঁড়াও দেখি কী করে। অস্তর (অস্ত্র) আছে, মাইরে দিতি পারে। অবশেষে চোর সবকিছু নিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল। স্বামী তার পথ পানে চেয়ে তখনও বলে যাচ্ছে– দাঁড়াও দেখি কী করে। সাঁইত্রিশ বছর আমরাও বলে যাচ্ছি, 'দাঁড়াও দেখি কী করে। অস্তর (অস্ত্র) আছে, মাইরে দিতি পারে।' ওই রাজাকাররা আমাদের রক্ত দিয়ে পাওয়া দেশটা, স্বাধীনতার অহঙ্কারটা ক্রমশ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে আর আমরা এখনও শুধু বলছি, দাঁড়াও দেখি কী করে। ওই ভাগ্যবান মওলানা মন্ত্রী হয়েছে। ভাগ্যের গুণে যদি প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যায় তারপরও কি বলব দাঁড়াও দেখি কী করে? আর কত দেখব? দেখাদেখি বাদ দিয়ে আসুন হুঙ্কার দিয়ে উঠি– জাগো বাহে কুন্ঠে সবাই?

সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! যুদ্ধাপরাধীর জামিন হয়, মুক্তিযোদ্ধার জামিন হয় না। মওলানা নিজামীদের জামিন হয়, মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদদের জামিন হয় না।

q_parvez@hotmail.com
লেখক: প্রবাসী সাংবাদিক

বৌদ্ধধর্ম মানবতার ধর্ম

বুদ্ধানন্দ মহাথেরো

বর্ষ পরিক্রমায় ঘুরে এলো শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা। এ পূর্ণিমার শুভতিথিতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ, ছয় বছর সাধনার মাধ্যমে গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের পর সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন (প্রথম ধর্ম দেশনা), শ্রাবস্তীর গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলে প্রতিহায্য ঋদ্ধি প্রদর্শন, মাতৃদেবীকে সদ্ধর্ম দেশনার জন্যে বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন এবং বৌদ্ধদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস আরম্ভ হয়। বুদ্ধ জীবনের অনেক ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলেই বৌদ্ধদের নিকট এ পূর্ণিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভলগ্নে তথাগত বুদ্ধের পুতজীবন ও বাণীর স্মরণ-মনন একান্ত কর্তব্য। তাই আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা। প্রয়াসী হই তাঁর বাণী ও নানা ঘটনাপঞ্জী বিশ্লেষণে। আলোকসামান্য প্রতিভা এবং ধ্যানবলে কপিলাবস্তুর রাজপুত্র শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তারপর নিজেকে ধীরে ধীরে বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গ করে দেশ ও কালের সীমানা পেরিয়ে সকল দেশের সকল যুগের মিত্র হয়ে গেলেন। ভারতের বুদ্ধ হলেন জগতের বুদ্ধ। তাই তো বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহামানব বুদ্ধকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবরূপে বন্ধনা করেছেন। এই মহামানবের স্মৃতিচারণের মাধ্যমেই আমাদের চিত্ত হবে কলুষমুক্ত, দিব্যজ্ঞানের শুভ্রতায় সমুজ্জ্বল এবং খুঁজে পাব সংসারের জাগতিক দুঃখ হতে মুক্তিলাভের উপায়।

মহামানব বুদ্ধ ছিলেন মৈত্রী ও করুণার মূর্তপ্রতীক। আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মানবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ দুঃখভারাক্রান্ত বসুন্ধরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরম আশ্চর্যের বিষয়, আড়াই হাজার বছর পূর্বে তথাগত বুদ্ধ দুঃখসন্তাপগ্রস্ত মানুষের দুঃখমুক্তির সত্য পথের দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় নামক চার আর্য সত্য। ভোগবাসনা চরিতার্থ করার মানসে মানুষ যে অকুশল কর্ম সম্পাদন

করে তাই মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। বৌদ্ধ দর্শনমতে, মানবসমাজের অশান্তি ও হানাহানির প্রধান কারণ ভোগবাসনায় জর্জরিত অপবিত্র চিত্ত। মানুষের মন লোভ-দ্বেষ-মোহে পঙ্কিল বলেই সমাজ এবং জাতীয় চিত্ত কলুষিত। প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্ত বিশুদ্ধির মধ্যেই সমাজ ও জাতির মুক্তি নিহিত। তাই তো মহামানব তথাগত বুদ্ধ বলেছেন—

"সব্ব পাপস্স অকরনং, কুশলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদাপনা, এতং বুদ্ধানু সাসনং।"

অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপকর্ম হতে বিরত থাকা, কুশলকর্ম সম্পাদন করা, স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখা, এটাই বুদ্ধের অনুশাসন। দেশ ও মানবসমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে করুনাময় বুদ্ধ শীল প্রতিপালনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের জীবনে পঞ্চশীলের গুরুত্ব অপরিসীম। পঞ্চশীলে বলা হয়েছে, (১) প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা, (২) অদত্ত বস্তু গ্রহণ বা চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা, (৩) ব্যভিচার বা মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকা, (৪) মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং (৫) মাদক বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা। এ পঞ্চনীতি প্রতিপালনে মানুষের জীবন হবে পবিত্র, সমাজ হবে সুস্থ-সুন্দর-দুর্নীতিমুক্ত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি-শৃঙ্খলা। চিত্তের পবিত্রতা সাধনের জন্য লোভ-দ্বেষ-মোহের বিলুপ্তি সাধন অপরিহার্য। লোভ-দ্বেষ-মোহের বিলুপ্তি ও প্রজ্ঞা লাভের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ শিক্ষা সংসারের জাগতিক দুঃখ হতে মুক্তিকামী মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। মৈত্রী ও করুণাবলে পশুশক্তিকে পরাভূত করে প্রগতিশীল অহিংসাভাবাপন্ন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি গঠনই হলো বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে অহিংসা, মৈত্রী, করুণা ও সাম্যের শাসন প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে তিনিই সমগ্র পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্মপ্রচার-প্রসারের জন্য যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন এবং বিশ্বময় বুদ্ধবাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তথাগত বুদ্ধ মানবজাতিকে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, ইপ্সিত বস্তুর অলাভজনিত সকল প্রকার দুঃখ হতে চিরমুক্তি লাভের জন্য যে আট প্রকার সত্যপথের দিকনির্দেশনা দান করেছিলেন সেগুলোকে বৌদ্ধ পরিভাষায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত করা হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গ যেমন— সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মূল বিষয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমেই মানবের পরম ও চরম মুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। নির্বাণের অন্য অর্থ হলো লোভ-দ্বেষ-মোহ বা তৃষ্ণাকে সমূলে ধ্বংস করে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ, সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান স্কন্ধ (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) সকল প্রকার দুঃখ হতে চিরমুক্তি লাভ করে বিমুক্তি সুখের অধিকারী হওয়াকেই নৈর্বাণিক সুখ বলা হয়। যাঁরা নির্বাণের যাত্রী তাঁরা স্বর্গ, দেবলোক, ব্রহ্মলোকের সুখকে কখনও বড় মনে করেন না। যেহেতু সেসব স্থানেও মানবলোকের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর কারণ রয়েছে। তাই স্বর্গ, দেবলোক, ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে চরম মুক্তি, পরম সুখ চিরশান্তিময় নির্বাণই একমাত্র লক্ষ্য।

আমরা জানি মহামানব বুদ্ধ কি রকম সমাজব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় ছিল উপনিষদ চর্চার যুগ। যাগ, যজ্ঞ, বলি, হোম এসবই ছিল ধর্মাচরণের প্রধান বিষয়। উপনিষদ চর্চায় সর্বক্ষেত্রে হতাশার স্বাক্ষর বহন করে। রাজ্য দখলের প্রতি লিপ্সা, যুদ্ধ, রাজ্য পরিবর্তন এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দুর্ভিক্ষ, মহামারী জীবনকে ছারখার করে দিচ্ছিল। সামাজিক বৈষম্যের ফলে দেখা দিয়েছিল বিক্ষোভ। উপনিষদ পরিস্থিতিকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। যে কারণে সৃষ্টি করেছিল রহস্যবাদ, জন্মান্তরবাদ, আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতিপ্রিয়তা ইত্যাদি। বুদ্ধের আবির্ভাবের পরও এ অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়নি। তখনও সমাজ জ্বলছিল দাউ দাউ করে। এরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বুদ্ধ প্রবর্তিত পঞ্চশীলে। জনগণকে পঞ্চশীলের উপদেশ দিয়ে প্রজ্বলিত আগুন প্রশমিত করেছিলেন। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণা।

প্রাচীন বিশ্বে ঘুণে ধরা সমাজে আধুনিক ধর্মের প্রবর্তনা এই প্রথম। দেশকালের বর্ণ-গোত্রের সীমানা অতিক্রম করে মানুষ মানুষকে দেখতে শিখল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনায় দৃশ্যমান মানুষকে ভালভাবে জানার সুযোগ পেল। মানুষ বুঝতে পারল নিজের তথা ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানবের কল্যাণ নিহিত নয়, ব্যক্তি বা সমষ্টির উন্নতি ও সুখের মধ্যেই সত্যিকারের মঙ্গল নিহিত। বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম ও সংঘের মূল সুর 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।' আজ তাই বিশ্বসংঘের মূল কাঠামোতে ধ্বনিত হচ্ছে, মানুষ মানুষে আত্মীয়তা, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিলোপ, সম্পদ বণ্টনে সমতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিরস্ত্রীকরণ, দুস্থের সেবা এবং পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি। পৃথিবীর মানবকুলের একান্ত কামনার বিষয়বস্তু ও আদর্শ হয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্তির সাফল্য কামনায় মানুষ প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম করত, সেই মানবকল্যাণমুখী সর্বজনীন শিক্ষা বৌদ্ধধর্মের প্রদর্শিত পথেই বিরাজমান।

ভাবতে অবাক লাগে, তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ বিশ্বে কি প্রচণ্ড দুর্নিবার সাহসে স্বনিষ্ঠ সাধনায় ঋদ্ধ আত্মশক্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর একজন মানুষ জগতের সকল মানুষকে উদার মানবিকতার অঙ্গনে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন– এসো দেখ, যদি সত্য ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় তাহলে গ্রহণ করো, অন্যথায় ত্যাগ কর। বৌদ্ধধর্মে শুধু মানুষের কল্যাণের কথা বলা হয়নি, জগতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, দৃশ্য-অদৃশ্য, আগত-অনাগত সকল জীবকুলের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। আর এখানেই বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যের অনন্যতা।

মহামানব গৌতম বুদ্ধ অনন্তগুণের অধিকারী মহাপুরুষ ছিলেন। সকল জীবের প্রতি তিনি সীমাহীন দয়া ও করুণা অনুভব করতেন বলে তাঁর নাম মহাকারুণিক। আপনপর তাঁর কাছে পার্থক্য ছিল না। সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণা ছিল অপরিসীম। বুদ্ধ বলেছেন– মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসেন, অনুরূপ ছোট বড় সমস্ত প্রাণীর প্রতিও সীমাহীন মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

তথাগত বুদ্ধের জীবন এক চরম ও পরম নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ নৈতিকতা বৌদ্ধধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বব্যাপী আজ অসত্য, অন্যায়, অত্যাচারের উন্মত্ততা প্রকাশে ব্যস্ত। হতাশায় মানবসমাজ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জমান। মূল্যবোধের অবক্ষয় সার্বিকভাবে মানুষকে উপনীত করেছে মানবেতর পর্যায়ে। এ অশুভ শক্তি ও কদর্য মানসিকতার নগ্ন প্রকাশে মানুষের সত্যিকার পরিচয় নয়। তার পরিচয় সাম্য, মৈত্রী, করুণার অসীম ধারার সন্ধানে। মানবপুত্র বুদ্ধই মানুষকে সন্ধান দিয়েছেন সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের পথ চির অমৃতপ্রাপ্তির সঠিক ঠিকানা। হিংসায় উন্মত্ত এবং নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বময় এ পৃথিবী মানুষের বসবাসযোগ্য ও আনন্দঘন হবে যদি বিশ্ববিবেক আমৃত্যু অহিংসা, সাম্য, মৈত্রীর অনুভবে সিক্ত হয়। কবির ভাষায় বলতে হয়–

"শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল, কর কলঙ্কশূন্য।"

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

লেখক : উপাধ্যক্ষ, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ
বিহার, ঢাকা।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য সঙ্কটের নেপথ্যে

গওসল আযম

মানুষ এবং খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বেড়েই চলেছে। মানুষের জীবন যাত্রাকে আরও মসৃণ করার জন্য বেড়ে চলেছে নিত্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। এদিকে বেড়ে চলেছে বৈশ্বিক তাপমাত্রাও। খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ নিকট ভবিষ্যতেই কমে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করা হচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষ খাবারের সঙ্কটে আছে। নিকট ভবিষ্যতে আরও ১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার হবে।

খাদ্য সঙ্কটের ভয়াবহতা অনুধাবনের জন্য এই্-এর মহাপরিচালকের প্রদত্ত একটি তথ্যের উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি বলেছেন, বিশ্বে ৪০-৫০ লাখ টন খাদ্যের মজুদ রয়েছে। এ মজুদ বিশ্বের জনসংখ্যার জন্য মাত্র ৮-১২ সপ্তাহের। তাই সারা বিশ্বে খাদ্যপণ্য নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

খাদ্যপণ্য নিয়ে তোলপাড়ের অন্য আরও একটি কারণ এই যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এখন উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের ১৪% জৈব জ্বালানিতে রূপান্তর করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন খাদ্যপণ্যের ৯% জৈব জ্বালানিতে রূপান্তর করছে। এই বিষয়ে ইউরোপ যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার বাস্তবায়ন সফল হলে ইউরোপও খাদ্যপণ্যের ১৪% জ্বালানি তেল রূপান্তর করতে পারবে খুব অল্প সময়ে।

বর্তমান অবস্থাতেই খাদ্য প্রাপ্তির অভাবে ক্যামেরুন, হাইতি, মিসর ও সেনেগালের মতো দেশে দাঙ্গা হয়েছে এবং হচ্ছে। আবার ভিয়েতনাম, চীন ও ভারতের মতো অন্য দুয়েকটি দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ চাল সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য ধান বা চাল রফতানিতে অনীহা প্রকাশ করছে। এই অবস্থায় আমদানির মাধ্যমে সময়মতো খাদ্য প্রাপ্তির আশা অনেকটা সঙ্কটে নিপতিত। এমনকি অনেক বিত্তশালী দেশ বা মহাদেশ যেমন অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপ তাদের খাদ্যপণ্যের ১৪% যুক্তরাষ্ট্রের মতো জৈব জ্বালানিতে রূপান্তর করলে খাদ্য সঙ্কট ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করবে।

অবস্থাদৃষ্টে একথা ভাবা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের মতো দেশের খাদ্য আমদানির উপর নির্ভর না করে নিজেদের দেশেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার। এ ব্যাপারে সরকারকে এখনই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশকে বর্তমান বার্ষিক ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৩ কোটি টন থেকে বাড়িয়ে ৫.১৮ কোটি টনে উন্নীত করতে হবে। কারণ হিসাবে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি দেশের হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনের তথ্য দেয়া হলো :

১. ভিয়েতনাম - ৪.০০ টন ২. ইন্দোনেশিয়া -৪.৫০ টন ৩. থাইল্যান্ড - ৫.০০ টন ৪. মিয়ানমার - ৩.১০ টন ৫. মালয়েশিয়া - ৩.৫০ টন ৬. দক্ষিণ কোরিয়া -৩.৬০ টন ৭. জাপান - ৭.০০ টন ৮. ভারত - ৪.০০ টন, ৯. চীন - ৩.২০ টন, ১০. বাংলাদেশ - ২.৭০ টন।

প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে ধারণা করা যায় যে, বাংলাদেশ যদি ধানের উৎপাদন দশটি দেশের গড় উৎপাদনের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে পারে তবে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫.১৮ কোটি টনে।

বাংলাদেশের মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। আর চায় বলেই বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া পোশাক শিল্পে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ভারি শিল্পের অন্তর্গত জাহাজ নির্মাণ শিল্পেও অনেকটা কৃতিত্ব স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের কৃষকও বাঁচার তাগিদে ফলন বাড়াবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের এ প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার জন্য ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগের হাসিনা সরকার যথা সময়ে কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে সার, বীজ, সেচের জল সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ সাময়িকভাবে হলেও সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের পর জোট আমলের খালেদা সরকার ২০০১-২০০৬ সালে আওয়ামী লীগের সাফল্যটুকু ধরে রাখতে পারেনি। বরং জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান অবলীলায় বলেছিলেন, বাংলাদেশ খাদ্যে উদ্ধৃত্ত হলে, সব বিদেশী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে জোট সরকার কৃষি ও খাদ্য বিভাগকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। দেশের সিএসডি, সাইলো, এসডিসহ অধিকাংশ খাদ্য গুদামকে অকেজো করে বেসরকারী খাতে লিজ দিয়েছে। চট্টলার হালি শহরে দেশের সর্ববৃহৎ সিএসডিকে বন্ধ করে দিয়ে ১ টাকা প্রতীকী মূল্যে বেপজাকে দিয়েছে। খাদ্যের বাফার স্টকের সাথে খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি বর্তমান সরকার অনুধাবন করে হালি শহরের ৫৭ একর জমির উপর নির্মিত খাদ্য গুদাম ফিরিয়ে নেয়ার সর্ব ব্যবস্থা করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে।

যেহেতু খাদ্যের উৎপাদন না বাড়িয়ে সামনের দিনগুলোতে খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলার আর কোন ভাল বা বিকল্প উপায় নেই, সেই হেতু সরকার নিম্নবর্ণিত উপায়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে।

প্রতি বছর আবাদযোগ্য জমির যে ১% বাড়ি, ঘর, কলকারখানা, অফিস আদালত নির্মাণের অধীনে আসছে, তা বন্ধ করা। নতুন খাল খনন না করে, নদী, নালা, খাল বিলের পুনর্খনন করা বা ড্রেজিং করা। এতে যেমন সেচ জলের প্রাপ্যতা বাড়বে– তেমনি বাড়বে মাছের চাষ।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে সঙ্কোচন করার নীতি পরিহার করে শস্যবীজ কৃষকদের কাছে সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপের মাধ্যমে জানা যায় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন মাত্র ১২% বীজ সরবরাহ করে। বাকি ৮৮% কৃষকরা নিজস্ব পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে। এর ফলে কৃষকদের সংরক্ষিত সিংহভাগ বীজই প্রত্যাশিত মাত্রার উৎপাদন দিতে পারে না। আবার কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কিছু অসাধু কর্মচারী বাজার থেকে অর্থাৎ কৃষকদের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে সরকারের ভাবমূর্তিতে আঘাত করার প্রয়াস পায়। এই অসাধুতা বন্ধ করার ব্যবস্থা খুঁজে বের করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

কৃষি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন খাদ্যশস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সম্প্রসারিত করা, যাতে কৃষক সহজেই উচ্চ ফলনশীল বীজ পেতে পারে। কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ বাজেটের ০.১৫% ব্যয় করে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এর পরিমাণ ০.৬২% এবং উন্নত বিশ্বে এর পরিমাণ ২.৮%। সুতরাং কৃষি গবেষণায় বাজেটের ১% বিনিয়োগের ব্যবস্থা নিলে দেশের মেরুদণ্ড কৃষিকে শক্তিশালী করতে পারবে বাংলাদেশ।

এখনও যেহেতু কৃষক সিংহভাগ বীজ নিজেদের মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে, সুতরাং তাদের বজি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পদ্ধতির ওপর মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। শুধু ধানের চারা সময়মতো রোপণ করে ধানের উৎপাদন বাড়ানো খুব একটা বড় ব্যাপার নয়।

বাংলাদেশেরই এক বিজ্ঞানীর সাথে আলাপে জানা যায়, আলো, বাতাস, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি জমির উর্বরতা ধরে রাখে, আমরা যেটাকে বলি ধভচর্ণ্ররলর্ডধঠফণ যমষণর মর্ত দণ্রমধফ. জমিতে প্রতিনিয়ত অগণিত বা অভাবিত পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। এগুলোর মৃত্যুও ঘটে অভাবিতভাবে। এদেরই দেহাবশেষ বা ফসিল জমির উৎপাদনশীলতা বা ধভচর্ণ্ররলর্ডধঠফণ যমষণর ধরে রাখে। মাটির এই উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার জন্য অব্যাহতভাবে ভূগর্ভস্থ পানির সেচকার্যে ব্যবহার অন্য কথায় বধভণরটফ ষর্টণর- ব্যবহার জমিতে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম প্রতিরোধ করে মৃত্যুও প্রতিরোধ করবে। এর ফলে জমি হারাবে উৎপাদনশীলতা বা ধভচর্ণ্ররলর্ডধঠফণ যমষণর। এটা রোধ করতে হলে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে, খাল, ডোবা, নদী নালার পানি ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। এটা করতে হলে বর্ষার পানি নদীনালায় ধরে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। অন্য কথায়, পানি ব্যবস্থাপনায় আমূল সংস্কার করে কৃষককে যথাসময়ে পানি সরবরাহ করতে হবে।

লেখক : প্রাক্তন নির্বাহী প্রধান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স

টুকরো গপ্পো

টেনশন

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে—

১ম জন : কী ব্যাপার, তোর মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে।

২য় জন : আর বলিস না, টেনশনে...

১ম জন : টেনশন! কিসের এত টেনশন শুনি?

২য় জন : চুল পড়ে যাওয়ার...

গপ্পো : রাকিবুল আমিন, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা

কার্টুন : শামসুদ্দিন